

চতুর্থ অধ্যায় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। সমগ্র বাংলাদেশ সামান্য পাহাড়ি অঞ্চল, সীমিত উচ্চভূমি এবং নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি নিয়ে গঠিত। এদেশের ভূপ্রকৃতি নিচু ও সমতল। বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন। জলবায়ুর উপর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব খুব বেশি। তাই বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আগমন ঘটে। বিভিন্ন ঋতুতে এ দেশের জলবায়ুর তারতম্যের কারণে আমরা কখনো গরম আবার কখনো শীত অনুভব করি। জলবায়ুর কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে অতিবৃষ্টি, অকাল বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে অবহিত হব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

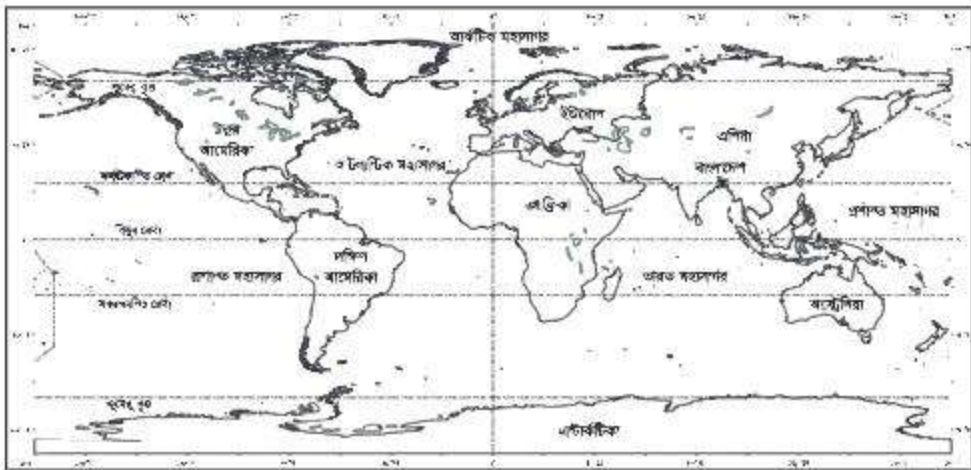
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা বর্ণনা করতে পারব;
- বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারব;
- বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূপ্রাকৃতিক গঠন কীভাবে জনসংখ্যার (জনবসতি) বিস্তরণে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের উপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব;
- বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মিয়ানমার ও নেপাল) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব;
- ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত কয়েকটি দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সচেতন হব এবং অভিযোজনে সক্ষমতা লাভ করব;
- ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করব।

পরিচ্ছেদ ৪.১ : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

বাংলাদেশ পলল গঠিত একটি অর্ধ অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের সামান্য পাহাড়ি অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমিত উচ্চভূমি ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি বড়ো নদী—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায় বাংলাদেশ অবস্থিত। এ দেশের ভূপ্রকৃতি নিচু ও সমতল।

ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ $20^{\circ}38'$ উত্তর অক্ষরেখা থেকে $26^{\circ}30'$ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং $88^{\circ}01'$ পূর্ব দ্রাঘিমাঙ্কের থেকে $92^{\circ}45'$ পূর্ব দ্রাঘিমাঙ্কের মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা ($23^{\circ}45'$) অতিক্রম করেছে। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৪৪০ কি.মি. এবং উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কি.মি.। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মিয়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬, ৯৭৭ বর্গমাইল।



চিত্র ৪.১ : বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ

ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ-নদী। এগুলোর মধ্যে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলী ইত্যাদি প্রধান। বাংলাদেশের ভূখণ্ড উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে অবস্থিত। ফলে এসব নদ-নদী, উপনদী ও শাখা নদীগুলো উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাহাড়ি অংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশটিই এসব নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি।

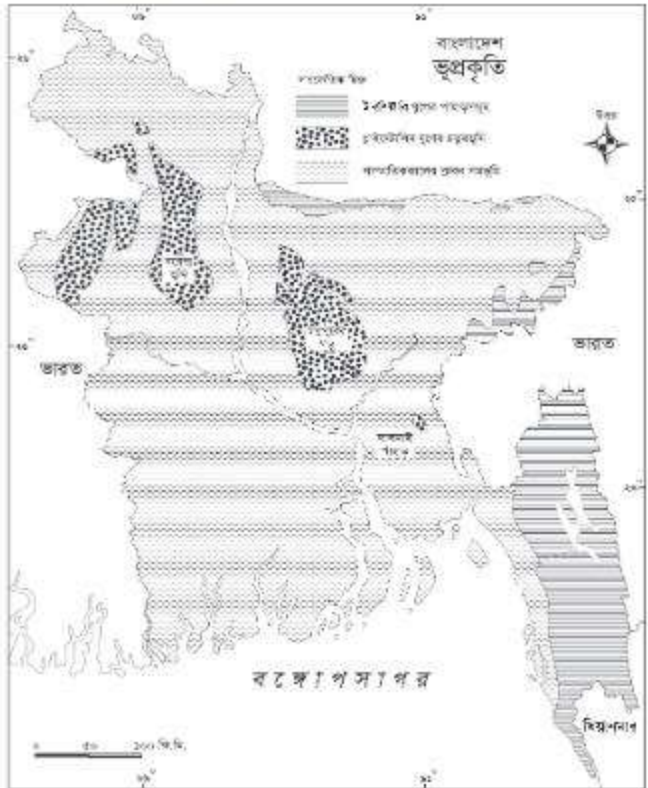
বাংলাদেশের সামান্য পরিমাণে উচ্চভূমি রয়েছে। ভূ-প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্রাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ ও সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি।

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ গঠিত। আজ থেকে প্রায় ২ মিলিয়ন বছরেরও আগে টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : রাজশাহী, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম তাজিওড়ং (বিজয়), যার উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হচ্ছে কিওক্সাডং, যার উচ্চতা ১,২৩০ মিটার। এ ছাড়া এ অঞ্চলের আরও দুটি উচ্চতর পাহাড়চূড়া হচ্ছে—মোদকমুয়া (১,০০০ মিটার) ও পিরামিড (৯১৫ মিটার)। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো বেলে পাথর, কর্দম ও শেল পাথর দ্বারা গঠিত।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর মধ্যে চিকনাগুল, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া প্রধান।

প্রাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি : বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্রাইস্টোসিন কাল বলা হয়। এই সময়ের আন্তঃবরফ গলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপানভূমি গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও



চিত্র ৪.২ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

ধূসর। কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত লালমাই পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার। এই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে এবং মাটি নুড়ি, বালি ও কংকর মিশ্রিত।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। সমতল ভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে এখানে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার পানির সঙ্গে পরিবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির

আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ, কুমিল্লা, নোরাখালী, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এলাকা এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকের সামান্য অংশ নিয়ে এ সমভূমি গঠিত। এছাড়াও চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলার কিছু অংশ জুড়েও এ সমভূমি বিস্তৃত। হিমালয় পর্বত থেকে আনীত পলল দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত। ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব-দ্বীপ সমভূমি গঠিত। নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্বত বিস্তৃত অঞ্চল হলো উপকূলীয় সমভূমি। খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি গঠিত। বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।



চিত্র ৪.৩: ভূপ্রকৃতির বিস্তৃতির পরিমাণ

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির গঠন, জনসংখ্যা ও জনবসতি

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান অষ্টম ভূখন্ডের তুলনায় এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বও খুব বেশি। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪.৯৭ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০১৫ জন। জনশুমারি-২০২২ অনুসারে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৯৮ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১২% এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১১৯ জন। ভূপ্রকৃতির গঠনের বিভিন্নতার কারণে এদেশে অঞ্চলভেদে জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য দেখা যায়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিতে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকতে মোটামুটি সব জায়গায় জনবসতি রয়েছে। তবে পার্বত্য এলাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চলে জীবিকা সংস্থান কষ্টসাধ্য হওয়ায় এ দুটি অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম। এসব অঞ্চলে ভালো রাস্তা-ঘাট বা রেল সংযোগ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জীবিকার সংস্থানও কষ্টকর। অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, বনভূমি ও ভূপ্রকৃতিগত কারণে এ সকল স্থান জনবিরল।

কাজ
একক : তোমার বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী
এলাকার ভূ-প্রকৃতি চিহ্নিত কর।

সমতল নদী অববাহিকা অঞ্চল উর্বর পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট। এ অঞ্চলে কৃষি আবাদ অনেকটা সহজসাধ্য। ফলে এসব অঞ্চলে ঘন জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। এসব অঞ্চলের নদীগুলো নাব্য, সড়কপথ ও রেলপথে যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা জনজীবনকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া জলবায়ুর প্রভাবের কারণেও জনবসতির বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর চেয়ে সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে মানুষ বসবাস করতে বেশি পছন্দ করে। বাংলাদেশে সব জায়গায় আবহাওয়া প্রায় একই রকম। তবে এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়ায় শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য কিছু বেশি উপলব্ধি হয়। কৃষির অনুকূল জলবায়ু চাষাবাদ এবং শস্য উৎপাদনের সহায়ক বলে সমভূমি মানুষের বসবাসকে আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশে যেসব অঞ্চলে খনিজ সম্পদ পাওয়া গেছে সে সব অঞ্চলে জীবিকার সম্পদে বহু শ্রমিক ও কর্মচারী জড়ো হয়ে এলাকাটিকে ঘনবসতিপূর্ণ করে তুলেছে। খনিজসম্পদ, কৃষিজসম্পদ ও বনজসম্পদ এবং প্রাণিজসম্পদকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এসব স্থানে প্রধান শিল্পের সঙ্গে ক্রমেই বহু প্রকার আনুষঙ্গিক শিল্প স্থাপিত হয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রধান শিল্পকে ভিত্তি করে এ সমস্ত অঞ্চল জনবহুল স্থানে পরিণত হয়েছে। তেজগাঁও, টঙ্গী, নরসিংদী, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শিল্প শহর গড়ে ওঠায় এ স্থানগুলোতে জনবসতি ঘন। সড়ক রেলপথ অথবা নদীপথে উন্নত চলাচলের সুযোগ থাকলে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সহজ হয়। ফলে স্থানটি জনবহুল অঞ্চলে পরিণত হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি আজকের যুগের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যেসব অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষি, সংস্কৃতি প্রভৃতির অনুশীলন ও চর্চায় সুযোগ বেশি, সেসব স্থানে জনবসতি স্বাভাবিক কারণেই বেশি হয়।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারে জনবসতি বিস্তারের প্রভাব

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনবসতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক কম। অধিক বসতি বিস্তারের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ আরও কমে গিয়ে ভূমির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশে এ জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজমির ওপর অব্যাহত চাপ পড়ছে। চাপ পড়ছে বাড়ির নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমির ওপর। বস্তুত বাংলাদেশে ইতোমধ্যে গ্রাম এবং শহরে বাসস্থান সমস্যা দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে কৃষি জমিগুলো উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হতে হতে খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাচ্ছে। আর এ খণ্ডিত জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও চাষাবাদ হয় না। জনবসতি বৃদ্ধির জন্য বহু আবাদি জমিতে ঘরবাড়ি বানানো হচ্ছে। ৩০ বছর আগে যে পরিবারের জমির পরিমাণ ছিল ১০০ বিঘা তার পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০ বিঘা বা তার চেয়েও কম। ১৯৭৪ সালে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.২৮ একর এবং বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ০.২৫ একর। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও হ্রাস পাবে। জনসংখ্যার আধিক্য এবং জনবসতি বিস্তারের প্রয়োজনীয়তায় মানুষ এখন ভূমির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও ব্যবহারকে বদলে দিয়েছে। ঝাল-ঝিল তরাত করে, বনজঙ্গল কেটে মানুষ এখন বসতি গড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে।

কাজ

একক : বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার ওপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাবসমূহ চিহ্নিত কর।

পরিচ্ছেদ ৪.২: বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

জলবায়ু বলতে একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে বুঝায়। মানুষের জীবনে জলবায়ুর প্রভাব বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ। মৌসুমি জলবায়ুর কারণে এদেশে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য ঘটে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, প্রাবৃত হয় বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। এতে অতিবৃষ্টি, অকাল বন্যা প্রভৃতি দেখা দেয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু

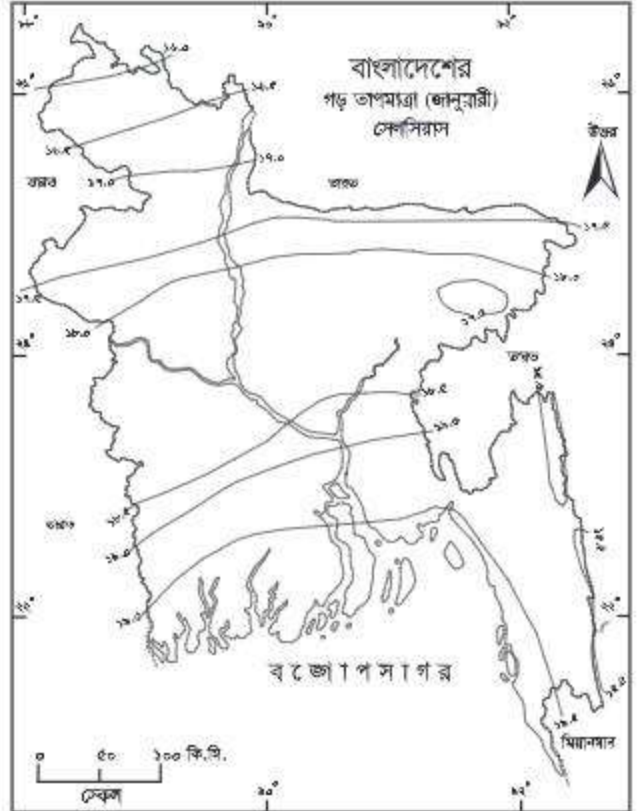
বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব এখানে এত অধিক যে, সামগ্রিকভাবে এ জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত।

দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশে বছরে তিন বৈশিষ্ট্যের ছয়টি ঋতু দেখা যায়, যেমন- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ঋতুভেদে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হয়, কিন্তু কখনো এটি অন্যান্য শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো চরমভাবাপন্ন হয় না।

তবে বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ছয়টি ঋতুকে প্রধান তিনটি ঋতু হিসেবে দেখানো যায়। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

শীতকাল : প্রতি বছর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে শীতকাল। এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে থাকায় বাংলাদেশে এর রশ্মি তির্যকভাবে পড়ে এবং উত্তাপের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। শীতকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমাণ যথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি সে. ও ১১ ডিগ্রি সে.। জানুয়ারি মাস বাংলাদেশের শীতলতম মাস। এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭ ডিগ্রি সে.। এ সময়ে দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কম হয়ে থাকে। সমতাপ রেখাগুলো অনেকটা সোজা হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থান করে। জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা চট্টগ্রামে প্রায় ২০ ডিগ্রি, নোয়াখালীতে ১৯.৪ ডিগ্রি, ঢাকায় ১৮.৩ ডিগ্রি, বগুড়ায় ১৭.৭ ডিগ্রি এবং দিনাজপুরে ১৬.৬ ডিগ্রি সে.। তবে কোনো কোনো সময় উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা আরও কম হয়ে থাকে।



চিত্র ৪.৪: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল। এটিই দেশের উষ্ণতম ঋতু। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। গড় হিসেবে উষ্ণতম মাস এপ্রিল। এ সময়ে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেশি থাকে। এপ্রিল মাসের গড় তাপমাত্রা কক্সবাজারে ২৭.৬৪ ডিগ্রি সে., নারায়ণগঞ্জে ২৮.৬৬ ডিগ্রি সে. এবং রাজশাহীতে প্রায় ৩০ ডিগ্রি সে. থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুর চাপের পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। একই সময়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে একধরনের ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এ ঝড়কে কলবৈশাখি (North Westerlies) বলা হয়। এছাড়া এপ্রিল ও মে মাসে বঙ্গোপসাগরে সূর্য নিম্নচাপসমূহের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রায়শ বিভিন্ন প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলে বিশেষত চট্টগ্রাম উপকূলে ব্যাপক সম্পদ ও জীবনহানি ঘটেছিল।

বর্ষাকাল : বাংলাদেশে জুন হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। জুন মাসের শেষদিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সাথে সাথে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়। এ সময় সূর্য বাংলাদেশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় এখানে অতিরিক্ত তাপ অনুভূত হওয়ার কথা। কিন্তু এ ঋতুতে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে তাপমাত্রা যেতপ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেতপ বৃদ্ধি পায় না।

তবে আবহাওয়া সর্বদা উষ্ণ থাকে। এ সময়কার গড় উষ্ণতা প্রায় ২৭ ডিগ্রি সে.। বর্ষাকালের মধ্যে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে।

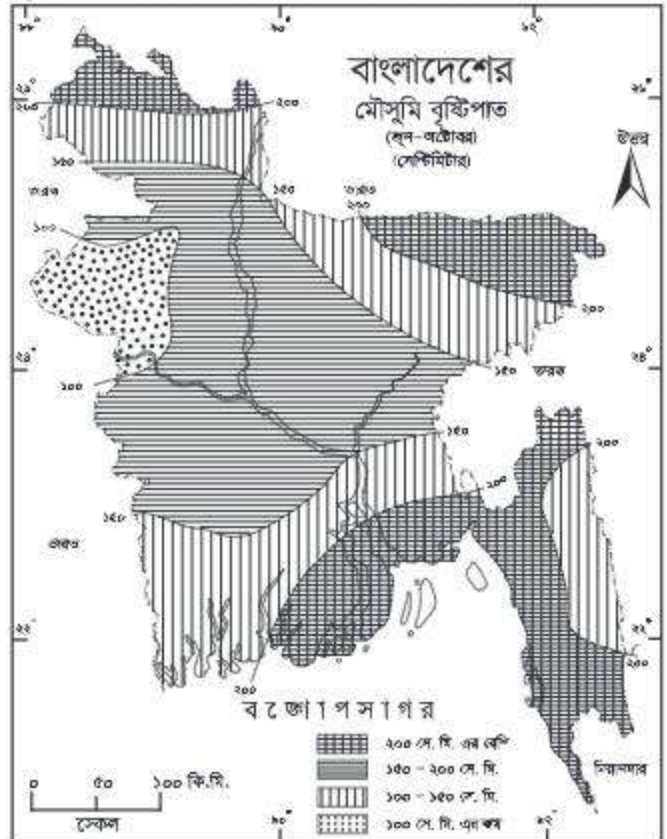
বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ বৃষ্টিপাত বর্ষাকালেই হয়ে থাকে। এ সময়কার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১১৯ সে.মি. এবং সর্বোচ্চ ৩৪০ সে.মি.। দেশের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বৃষ্টিপাত ক্রমেই বেশি হয়ে থাকে। যেমন- পাবনায় প্রায় ১১৪ সে.মি., ঢাকায় ১২০ সে.মি., কুমিল্লায় ১৪০ সে.মি., শ্রীমঙ্গলে ১৮০ সে.মি. এবং রাজশাহীতে ১৯০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়।

বাংলাদেশের বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ ঋতুতে পর্বতের পাদদেশে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের কোথাও ২০০ সে.মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয় না। সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চলে ৩৪০ সে.মি., পটুয়াখালীতে ২০০ সে.মি., চট্টগ্রামে ২৫০ সে.মি., রাজশাহীতে ২৮০ সে.মি. এবং কক্সবাজারে ৩২০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

ভারতের জলবায়ু : বিশাল আয়তনের দেশ হওয়ায় ভারতের জলবায়ু বিচিত্র। অক্ষাংশ, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির ভিন্নতার কারণে এর জলবায়ুও ভিন্ন। ভারত মৌসুমি অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এ দেশের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, অর্দ্রতা ইত্যাদি মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে ভারতের ঋতুগুলো হলো: শীতকাল, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল এবং শরৎ ও হেমন্তকাল।

শীতকাল : শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করায় সমগ্র ভারতে উত্তাপের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। ভারতে শীতকাল ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময় এদেশের উপর দিয়ে পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। হিমমন্ডল থেকে নির্গত হওয়ায় এবং স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বায়ু শুষ্ক ও শীতল। হিমালয় পর্বতমালা উত্তর অঞ্চল জুড়ে প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়ায়মান থাকায় এ শুষ্ক ও শীতল বায়ু সরাসরি ভারতে প্রবেশ করতে পারে না; এজন্য ভারত শীতের কবল থেকে রক্ষা পায়। শীত ঋতুতে সমগ্র ভারতের আবহাওয়া মোটামুটি শুষ্ক, শীতল ও আরামদায়ক। আকাশ থাকে স্বচ্ছ, নির্মল ও মেঘমুক্ত। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে।

গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ভারতে গ্রীষ্মকাল। ২১শে মার্চ সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে নিরক্ষরেখায় আসে এবং তারপর ক্রমশ উত্তরে ককটিক্রান্তি রেখার দিকে অগ্রসর হয়। সূর্যের এ উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় গঙ্গা নদীর উপত্যকায় গড়ে ২৭ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। যতই উত্তরে যাওয়া যায় ক্রমশ তাপমাত্রা



চিত্র ৪.৫: বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত

বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমে মরু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত ওঠে। মে মাসে কলকাতা শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সে. পর্যন্ত উঠলেও গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সে. এর বেশি হয় না।

বর্ষাকাল : জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে বর্ষাকাল থাকে। জুন মাসের শেষে (২১ জুন) সূর্য ককটক্রান্তি রেখার ওপর অবস্থান করায় উত্তর ভারতে উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত (৩২ ডিগ্রি সে. এর উপরে) বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণে ক্রমশ তাপমাত্রা কমতে কমতে শেষপর্যন্ত ২৭ ডিগ্রি সে. এর নিচে নেমে যায়। অতিরিক্ত তাপে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ সময় দক্ষিণ

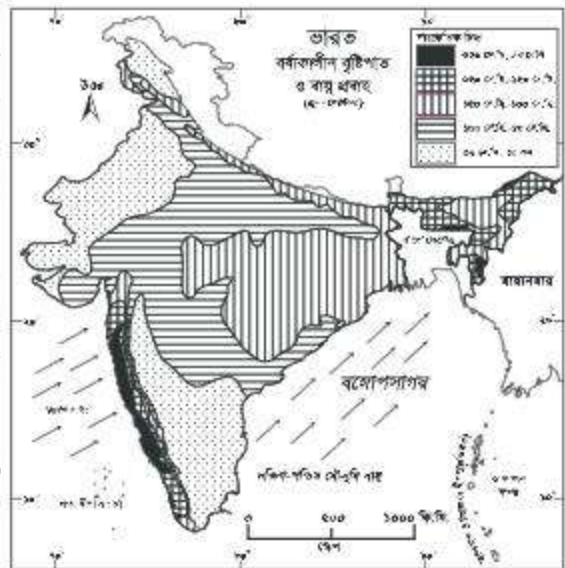


চিত্র ৪.৬ : ভারতের গ্রীষ্মকালীন সমতাপ রেখা

গোষ্ঠার মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে দক্ষিণপূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ে প্রবেশ না করে পাঞ্জাবের অধিক শক্তিসম্পন্ন নিম্নচাপের টানে সরাসরি পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয়। এ বায়ু সমুদ্রের ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বপে এতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। হিমালয় ও অন্যান্য উচ্চ পর্বতগোষ্ঠে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এ বায়ু ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৭৫% ভাগ এ ঋতুতেই হয়ে থাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে, যেমন-আরব সাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত আরবসাগরীয় শাখা এবং বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগরীয় শাখা।

শরৎ ও হেমন্তকাল : অক্টোবর-নভেম্বর দুই মাস ভারতে শরৎ ও হেমন্তকাল। এ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দিক পরিবর্তন করে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হতে থাকে। ফলে ভারতের কোনো কোনো স্থানে ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত



চিত্র ৪.৭ : ভারতের বর্ষাকালীন বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত

হয়। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর উপকূলে এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ ঋতুকে 'আঘিনা বড়' বলে। হেমন্তকালের শেষদিকে ভারতের সর্বত্র তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে।

মিয়ানমারের জলবায়ু

মিয়ানমারের জলবায়ু ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ক্রান্তীয় মৌসুমি ধরনের। এ অঞ্চলের জলবায়ুতে শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা-এ তিনটি আলাদা ঋতুর উপস্থিতি স্পষ্ট। মিয়ানমারের জলবায়ুর ঋতুভিত্তিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো -

গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত মিয়ানমারে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে এ দেশের অধিকাংশ স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৯ ডিগ্রি সে. এর কাছাকাছি পৌঁছে। সূর্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে বিধায় এ সময় মধ্য এশিয়ায় বিরাট নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং এ অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ শুরু হয়। এ সময়ে ভামোতে ১৯ ডিগ্রি সে., মাদাগয়ে ৩২ ডিগ্রি সে. এবং ইয়াঙ্গুনে প্রায় ২৭ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা বিরাজ করে।

বর্ষাকাল : জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মিয়ানমারে বর্ষাকাল। এ সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াঙ্গুনে বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং মাসের শেষ দিকে এটি সারা দেশে বিস্তার লাভ করে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ বৃষ্টিপাত চলতে থাকে। মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আরাকান ও টেনাসেরিম উপকূলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ২০০ সে. মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এসময় দেশের সর্ব উত্তরের পাহাড়িয়া অঞ্চলেও মাত্র ৮০ সে.মি. পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকাল : এ ঋতুতে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করার উত্তর গোলার্ধে এশিয়ার মধ্যভাগে এক বিরাট উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকের সমুদ্রে অপেক্ষাকৃত অধিক তাপযুক্ত অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে উত্তর-পূর্ব জায়ন বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তরের এ শীতল বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে মিয়ানমারে তখন বেশ শীত হওয়ার কথা থাকলেও উত্তরাংশে পার্বত্য অঞ্চলের উপস্থিতির কারণে শৈত্য তত প্রকট আকার ধারণ করে না। এ বায়ুপ্রবাহ মার্চ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে উত্তর মিয়ানমারের উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত হয় এবং তাপমাত্রা হিমাজ্জের কাছাকাছি চলে যায়।

কাজ

দলগত : বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

নেপালের জলবায়ু

নেপালের জলবায়ুতে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য বিবেচনায় স্পষ্টত দুটি ঋতু পরিলক্ষিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি থাকে। এজন্য এ সময়কালকে বর্ষাকাল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জুলাই মাসে কাঠমন্ডুর তাপমাত্রা থাকে ২৪.৪ ডিগ্রি সে.। অন্যদিকে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় অত্যন্ত শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন থাকে। এ সময় তাপমাত্রাও বেশ কম থাকে বলে একে শীতকাল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জানুয়ারিতে কাঠমন্ডুর তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১০ ডিগ্রি সে.। উঁচু পার্বত্য এলাকা হওয়ায় নেপালের কোনো অংশের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় না এবং শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্যও খুব বেশি অনুভূত হয় না। নেপালের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৪৫ সে.মি. যার প্রায় পুরোটাই সংঘটিত হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে।

বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর জলবায়ুর প্রভাব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুজনিত কারণে এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন অধিক মাত্রায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন-জীবিকায় নানা পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদ-নদীর ভাঙন প্রভৃতি মানুষের জীবন-জীবিকায় পরিবর্তন আনে। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এতে বিভিন্ন রকমের

ফসল ও ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এদেশে স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। ফলে ধান, গম, তামাক এবং নানা জাতের ডাল, তৈলবীজ, গোলআলু, পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রবিশস্য এবং নানান ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করা যায়। জলবায়ুর কারণে সৃষ্ট বন্যার পানিবাহিত পলিমাটি কৃষিক্ষেত্রগুলোর উর্বরতা বাড়ায়, এতে ফসল অনেক ভালো হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের সর্বত্র গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত হচ্ছে আবার বর্ষাকাল দেরিতে আসছে। স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, ভারি বর্ষণের ফলে ভূমিধস, বন্যা ও পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেছে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে হিরন পয়েন্ট, চর চংগা ও কক্সবাজারের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর গড়ে ৪ মি.মি. থেকে ৬ মি.মি. পর্যন্ত বেড়েছে।

নদীমাতৃক এদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী বাঁচিয়ে রাখে মানুষের জীবন-জীবিকা ও উৎপাদন। উজানে দেওয়া প্রতিবেশী দেশের বাধ ও নদী সংযোগ প্রকল্পগুলোর প্রভাবে অভিন্ন নদীগুলোর পানি প্রবাহ কমে গেছে। পলি জমে বহু নদী হারিয়ে যাচ্ছে। নদীর অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে। এছাড়া নদীর ভাঙনে প্রায় লাখ লাখ মানুষ বাসতাহারা হয়ে জীবন-জীবিকার টানে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ কৃষক ও দিনমজুর কাজের আশায় শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। এতে পারিবারিক ভাঙন দেখা দিচ্ছে। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবেশের সাথে জীবন জীবিকার সম্পর্ক খুব গভীর। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে নিচিহ্ন হয়েছে

কাজ
একক : পরিবেশের উপর জলবায়ুর
পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত কর।

প্রাণিজগতের অনেক প্রাণী, বিকৃত হয়েছে জীববৈচিত্র্য, কমেছে খাদ্য উৎপাদন। এতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বেড়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেরদের পেশা বদলে যাচ্ছে। বহু জেলে জীবিকার টানে শহরে ছুটছে। উপকূলীয় জনগণের জীবিকা কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এসব অঞ্চলের দরিদ্র, অতি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী মানুষের জীবন-জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন-পুকুর, খাল, জমি, বাগান, গাছ, মাছ ইত্যাদি ঘিরেই চলে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নানামুখী দুর্ভোগের কারণে তাদের জীবন ধারণের ভিত্তি হারিয়ে যাচ্ছে। জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, বন্যা, প্রাণন, ঝড়, সিডর, আইলা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্ভোগ মানুষের জীবন-জীবিকাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। অপরিবর্তনীয় উন্নয়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনে গ্রাম থেকে শহরে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের ভিড় বাড়ছে।

ভূমিকম্পের ধারণা

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্ভোগ। পৃথিবীর বহু দেশে এবং বহু অঞ্চলে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সভ্যতার বহু ধ্বংসলীলার কারণ হিসেবে ভূমিকম্পকে দায়ী করা হয়। ধারণা করা হয়, গত ৪,০০০ বছরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার পৃথিবীর প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ লোক মারা গেছে। নানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ভূত্বকের নিচের অংশে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো থেকে তাপ বিচ্ছুরিত হয়। এই তাপ সঞ্চিত হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং সেখানে প্রবল শক্তি উৎপন্ন হয়ে ভূত্বকের বিভিন্ন অংশে আণ্ডোলন ও পরিবর্তন সাধন করছে। অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা ভূত্বকের এই পরিবর্তন আকস্মিক প্রক্রিয়া ও ধীর প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। আকস্মিকভাবে পরিবর্তনকারী শক্তির মধ্যে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি প্রধান।

কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ হঠাৎ কোনো কারণে কঁপে ওঠে। এ কম্পন অত্যন্ত মৃদু থেকে প্রচণ্ড হয়ে থাকে, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। ভূপৃষ্ঠের এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। ভূঅভ্যন্তরের যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (Focus) বলে। কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি উপরের ভূপৃষ্ঠের নাম উপকেন্দ্র (Epicenter)। কম্পনের বেগ উপকেন্দ্র হতে ধীরে ধীরে চারিদিকে কমে যায়।

ভূমিকম্পের কারণ

ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধানকালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন পৃথিবীর বিশেষ কিছু এলাকায় ভূকম্পন বেশি হয়। এ সমস্ত এলাকায় নবীন পর্বতমালা অবস্থিত। পৃথিবীর ব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে ভূ-ত্বক ৮টি বড়ো বড়ো টুকরা এবং ৬টি আঞ্চলিক টুকরা দ্বারা বিভক্ত। এগুলো টেকটনিক প্লেট নামে পরিচিত। ভূপৃষ্ঠে যেসব কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো এই প্লেটগুলোর বিভিন্ন রকমের স্থানান্তর বা বিচ্যুতি। এছাড়াও অন্য যেসব কারণে ভূমিকম্প হয় তা নিম্নরূপ:



চিত্র ৪.৮ : ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ভূনিম্নস্থ শিলাস্তরে ভারের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ফাঁটল ও ভাঁজের সৃষ্টির ফলে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূআলোড়নের ফলে ভূত্বকের কোনো স্থানে শিলা ধসে পড়লে বা শিলাচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়। এছাড়াও পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি প্লেটের একটি অপরাটির সীমানা বরাবর তলদেশে ঢুকে পড়ে অথবা অনুভূমিকভাবে আগে-পিছে সরে যায়। এ ধরনের সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

কাজ
একক : ভূমিকম্পের কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

ভূমিকম্পের ফলাফল

ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন ও ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকে অসংখ্য ফাঁটল এবং চ্যুতির সৃষ্টি হয়। কখনো সমুদ্রতলের অনেক স্থান উপরে ভেসে ওঠে। আবার কখনো স্থলভাগের অনেক স্থান সমুদ্রতলে ডুবে যায়। অনেক সময় নদীর গতি পরিবর্তিত বা বন্ধ হয়ে যায়। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে পর্বতগাত্র থেকে বৃহৎ বরফখণ্ড হঠাৎ নিচে পতিত হয় এবং পর্বতের পাদদেশে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ভূমিকম্পের ধাক্কায় সমুদ্রের পানি তীর থেকে নিচে নেমে যায় এবং পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন সহকারে ১৫-২০ মিটার উঁচু হয়ে ঢেউয়ের আকারে উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে। এ ধরনের জগোচ্ছ্বাসকে সুনামি বলে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভূকম্পনের ফলে সৃষ্ট সুনামির আঘাতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে ব্যাপক জ্ঞানমালের ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের ফলে কখনো উচ্চভূমি সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়। আবার কখনো সমুদ্রের তলদেশের কোনো স্থান উঁচু হয়ে সমুদ্রে দ্বীপের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে ভূপৃষ্ঠে অনুভূমিক পার্শ্বচাপের প্রভাবে কঁচকে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চল থেকে ধস নেমে নদীর গতি রোধ করে হ্রদের সৃষ্টি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে বহু প্রাণহানি ঘটে। ভূমিকম্পে রেলপথ, সড়কপথ, পাইপ লাইন প্রভৃতি ভেঙে যায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতি ছিঁড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমুদ্রের তলদেশে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলে ভূপৃষ্ঠের বড়ো বাঁধ, কালভার্ট, সেতু প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও অনেক সময় সুনামির সৃষ্টি হয়।

কাজ
দলগত : ভূমিকম্পের প্রভাবের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের পদক্ষেপ : যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক পূর্বাভাস ক্ষয়ক্ষতির হার কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে দুর্যোগের উৎপত্তির স্থান, সময়, স্থায়িত্বকাল এবং এর শক্তিমাত্রা ও সম্ভাব্য কবলিত এলাকা সম্পর্কে

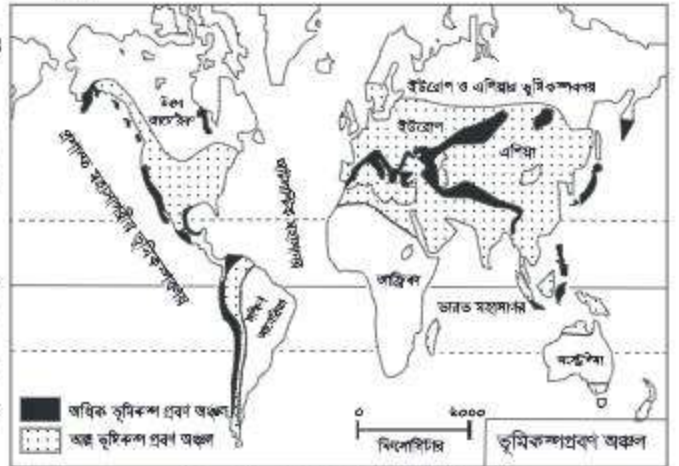
সঠিক পূর্বাভাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দুর্ঘটনের চেয়ে ভূমিকম্পের প্রকৃতি আলাদা। এটি অকস্মাৎ সংঘটিত হয়, খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং ভূতাত্ত্বিক ঘটনা থাকে। ফলে সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। তারপরেও কিছু পদক্ষেপ নিলে ভূমিকম্প অনুমানে সহায়ক হবে, জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা হ্রাস করা যাবে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, যে সমস্ত অঞ্চলে গত ১০০ বছরে ভূমিকম্প হয়নি অথচ সাধারণভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত, সেখানে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা খুব বেশি। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্য জাপান, মধ্য চিলি, তাইওয়ান এবং সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত অঞ্চলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে রিখটার মান-এ উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা আছে। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

বাড়ি তৈরির সময় মাটি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ নিয়ে বাড়ির ভিত মজবুত করতে হবে। বাড়ি তৈরির সময় দুটি বাড়ির মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব রাখতে হবে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার একাধিক পথ রাখতে হবে এবং বহুতল ভবনে জরুরি সিঁড়ি রাখতে হবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে। বাড়ির আসবাবপত্র যথাসম্ভব কাঠের হওয়া ভালো। প্রতিটি বাড়িতে সদস্যদের জন্য হেলমেট রাখতে হবে। ভূমিকম্পের সময় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সুইচ বন্ধ রাখতে হবে। তাড়াহুড়া না করে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে।

বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল (World's Earthquake Prone Regions)

ভূমিকম্পের প্রকোপ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোকে নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশ : প্রশান্ত মহাসাগরের বহিঃসীমানা বরাবর সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়। এ অংশের জাপান, ফিলিপাইন, চিলি, অ্যালিসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও অ্যালাস্কা সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত।



চিত্র ৪.৯ : বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

ভূমধ্যসাগরীয়-হিমালয় অংশ : এ অংশ আন্দ্রস পর্বত থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর হয়ে ককেশাস, ইরান, হিমালয়, ইন্দোচীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

মধ্য আটলান্টিক-ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা অংশ : উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা এবং ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা একত্রিত হয়ে মিশে আফ্রিকার লোহিত সাগর বরাবর ভূমধ্যসাগরীয় অংশের সঙ্গে মিলেছে। এ তিনটি প্রধান বলয় ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং মহাসাগরের খাদে কিছু কিছু অংশে ভূমিকম্পের প্রকোপ দেখা যায়।

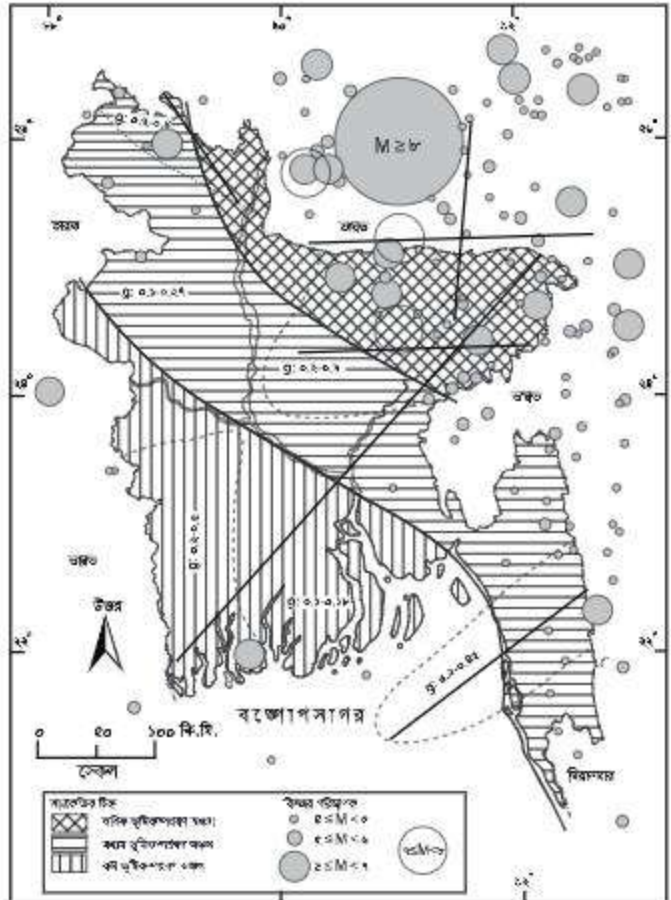
বাংলাদেশে ভূমিকম্পের কারণ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান ও ইউরোপিয়ান প্লেটের সীমানার কাছে অবস্থিত। এ কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। ভূমিরূপ ও ভূতাত্ত্বিক কাঠামোগত কারণে বাংলাদেশে ভূআলোড়নজনিত শক্তি কার্যকর এবং এর ফলে এখানে ভূমিকম্প হয়।

মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে দেশের কিছু অংশে দেরে যাচ্ছে আবার কিছু অংশে কেঁপে উঠে যাচ্ছে। এভাবে ভূস্থিতির ফলে

ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিকম্পের কারণে ফাটলের সৃষ্টি হয়। ভূমিবৃপজনিত কারণেও ভূমিকম্পের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাহাড়কাটাসহ মানবসৃষ্ট কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত। বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে। ভূস্তরের ভূমিকম্প প্রবণ ইন্ডিয়ান প্লেট ও মিয়ানমার সাব-প্লেটের মাক্‌থানে বাংলাদেশ অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও এর পার্শ্ববর্তী বিশেষ করে উত্তর ও পূর্বদিকে ভূমিকম্প হওয়ার মতো যথেষ্ট ফস্ট বা চ্যুতি বিরাজ করছে। এই চ্যুতি আসামের ডাউকি ডেঞ্জার চ্যুতির সাথে সংযুক্ত। এই ডেঞ্জার ফস্ট লাইনে অবস্থান করছে বাংলাদেশের সিলেট জেলা। ১৯৮৯ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয় সংবলিত মানচিত্র তৈরি করেন। এতে ৩টি বলয় দেখানো হয়েছে। প্রথম বলয়কে ‘প্রলয়ঙ্করী’; দ্বিতীয় বলয়কে ‘বিপজ্জনক’ এবং তৃতীয় বলয়কে ‘লম্বু’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই বলয়সমূহকে বলা হয় ‘সিসমিক রিস্ক জোন’। প্রলয়ঙ্করী বলয়ে রয়েছে বান্দরবান, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর। বিপজ্জনক বলয়ে ঢাকা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, কুমিল্লা ও রাজশাহীর অবস্থান। দেশের অন্যান্য অঞ্চল লম্বু বলয়ে অবস্থিত।



চিত্র ৪.১০ : বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাসমূহ

ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

বাংলাদেশে বড়ো ভূমিকম্পের বিপর্যয় মোকাবিলায় ন্যূনতম প্রস্তুতি নেই। নাজুক উদ্ভার তৎপরতার কারণে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পেই ঢাকায় মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। অসহায়ভাবে মৃত্যুর শিকার হতে পারে লাখ লাখ মানুষ। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অগ্নিকেন্দ্রিত নগরায়ণ, অধিক বহুতলভবন, খোলা জায়গার অভাব, সরু গলিপথ, উদ্ভার উপকরণের দুরবস্থার কারণেই রাজধানীতে ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি বাড়ছে। ভূমিকম্প বিষয়ে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই ভূমিকম্পের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব। আমরা একটু গুরুত্বের সাথে লক্ষ করলে দেখতে পাব যে, আমাদের দেশে যদি ৩০ থেকে ৩৫ সেকেন্ডের কোনো ভূমিকম্প হয় তবে ভূমিকম্পের ফলে প্রাণহানি ঘটবে তার চেয়ে বেশি

প্রাণহানি ঘটবে উপ্কার কাজের ব্যর্থতার জন্য। এজন্য ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভূমিকম্প খুব অল্প সময়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এটা সামান্য সময় স্থায়ী হয় এবং অকস্মাৎ ভূ-অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। ফলে সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। এতদসত্ত্বেও ভূবিজ্ঞানীরা ভূমিকম্প মোকাবেলায় বেশকিছু পূর্ব প্রত্নত্বমূলক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন যা গ্রহণ করলে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি

ভূমিকম্পের জন্য যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তা হলো- যারা নতুন বাড়ি তৈরি করবেন তাদের স্ট্রাকচার ও ডিজাইন করার সময় 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' অনুসরণ করতে হবে। দক্ষ প্রকৌশলীর তদারকির মাধ্যমে ভালো নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে বাড়ি তৈরি করতে হবে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধক পাকা বাড়ি তৈরি করতে কতিপয় বিষয়ের দিকে সূক্ষ্ম নজর দিলে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবননাশের মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব, যথা- ইটের তৈরি দেয়াল করলে ৪ তলার উপরে ভবন না করা; ভবন দোতলার বেশি হলে প্রতিটি কোনায় ইটের মাঝখানে ও প্রত্যেক জানালা ও দরজার পাশ দিয়ে খাড়া রড ঢোকাতে হবে। দরজা ও জানালা ঘরের কোনায় না হওয়াই ভালো। এই সতর্কতা অবলম্বন করলে ইটের দেয়ালের ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে। ভূমিকম্পের সময় দেয়ালে ফাটল ধরলেও ধসে পড়ার আশঙ্কা কমে যাবে।

গ্রামাঞ্চলের টিনের ঘরগুলোর ভূমিকম্প ক্ষতির আশঙ্কা কম। তবে মাটির তৈরি বাড়িঘরের ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এজন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কোনাকুনিভাবে বাঁশ বা কাঠের বেসিং ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদি কোনো ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তবে ভবনটিকে নির্মাণের পর শক্তিশালী করা যেতে পারে। এ জন্য কংক্রিট বিল্ডিং-এর জন্য অতিরিক্ত রড ব্যবহার করে কংক্রিট ঢালাই দিয়ে দুর্বল স্থানগুলোর আয়তন ও আকার বাড়ানো যেতে পারে। অনেক সময় ফেরো সিমেন্ট দিয়ে ইটের দেয়ালে প্রলেপ দিলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভবনের নিচতলা সম্পূর্ণ খোলা রাখা উচিত নয়। সেমিপাকা ঘরগুলোর চারপাশে টানা দিয়ে বেঁধে রাখলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ভূমিকম্পের প্রস্তুতিস্বরূপ একজন ব্যক্তির করণীয়

বাড়িতে একটি ব্যাটারিচালিত রেডিও এবং চর্চ বাতি সব সময় রাখা। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা। বাড়ির গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের মেইন সুইচ কোথায় তা জেনে রাখা এবং এগুলো কীভাবে বন্ধ করতে হয় তা শিখে রাখা। বাড়ির সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থানটি চিহ্নিত করা। হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড প্রভৃতির ফোন নাম্বার সাথে রাখা। স্কুলে বাচ্চাদের ভূমিকম্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে তা শিখিয়ে দেওয়া। খেলার মাঠে থাকাকালীন সময়ে দালানকোঠা থেকে দূরে থাকা।

ভূমিকম্প চলাকালীন জনসাধারণের করণীয়

নিজেকে ধীরস্থির ও শান্ত রাখা। একতলা দালান হলে দৌড়ে বাইরে চলে যাওয়া এবং কোনো কিছুর লোতে ঘরে অবস্থান না করা। বাড়ির বাইরে থাকলে ঘরে প্রবেশ না করা। বহুতল দালানের ভিতর থাকলে এবং রাতে ভূমিকম্প হলে টেবিল বা খাটের নিচে ঢুকে যাওয়া এবং কাচের জানালা থেকে দূরে থাকা। প্রয়োজনে ঘরের কোণে বা বিল্ডিং এর কক্ষামের গোড়ায় আশ্রয় নেওয়া।

ঘরের বাইরে থাকলে দালান, বড় গাছ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন থেকে দূরে থাকা। উঁচু দালান, জানালা বা ছাদ

কাজ

একক : ভূমিকম্প চলাকালীন একজন ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কিত তালিকা প্রস্তুত কর।

থেকে লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা না করা। রাস্তায় গাড়িতে থাকলে গাড়ি না চালিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখা। পাহাড়, উঁচু খাদ বা ঢালু জমিতে ভূমিধসের আশঙ্কা থাকে তাই এসব স্থান থেকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়া।

ভূমিকম্পের পর একজন সচেতন ব্যক্তির করণীয়

নিজের এবং অন্যদের আঘাত পরীক্ষা করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া। পানি, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক লাইন পরীক্ষা করা। বাড়ির দরজা-জানালা খুলে দেওয়া। রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম খোলা রাখা, যাতে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রচারিত তথ্য শোনা যায়। খালি পায়ে চলাফেরা না করা। লুটতরাজ থেকে সাবধান থাকা এবং অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ মতো চলা।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ কত ডিগ্রি অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত?
২. বাংলাদেশের উত্তরের পাহাড়গুলোকে টিলা বলা হয় কেন?
৩. ‘আশ্বিনা ঝড়’ বলতে কী বোঝায়?
৪. উপকেন্দ্র কী?
৫. ‘সিসমিক রিস্ক জোন’ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের বিভিন্ন স্থানে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটান কারণ ব্যাখ্যা কর।
২. ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ভূঅভ্যন্তরীণ শক্তি ও প্লেটসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রাম
খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান
ঘ. রাজশাহী

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২, ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিস্তানা ডিসেম্বর মাসের এক বিকেলে বাবা-মায়ের সাথে মেলায় যায়। হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হলে তারা দ্রুত একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। তবে সামান্য বৃষ্টিপাতের পরেই মেঘ কেটে যায়।

২. রিস্তানার দেখা বৃষ্টিপাতটি কোন বায়ুর প্রভাবে ঘটেছে?
ক. উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু
খ. উত্তর-পশ্চিম শীতল বায়ু
গ. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু
ঘ. দক্ষিণ-পশ্চিম শুষ্ক বায়ু
৩. উক্ত বৃষ্টিপাতে কোন ফসল উৎপাদন করা যায়?
ক. ভুট্টা
খ. গম
গ. পাট
ঘ. তুলা

৪. জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে—

- মানুষের পেশাগত পরিবর্তন ঘটছে
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
- বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী বিপন্ন হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

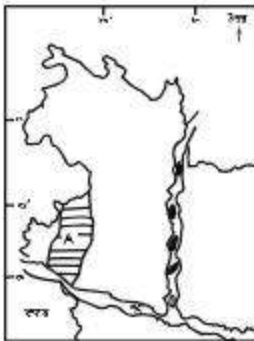
খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



চিত্র : বাংলাদেশের মানচিত্রের অংশবিশেষ



চিত্র : বাংলাদেশের মানচিত্রের অংশবিশেষ

ক. বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে?

খ. বাংলাদেশের নদীগুলো বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয় কেন?

গ. মানচিত্রের 'A' চিহ্নিত অঞ্চলটির ভূপ্রাকৃতিক গঠন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলের কোনটিতে অধিক কী পরিলাক্ষিত হবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।